রুপসু কবিতা

শান্তনু বন্দ্যোপাধ্যায়

রেলের ক্রসিং, তার গায়ে কাচের দোকান, কাচ কাটে,
কাটাকুটি করে মেঝেয়, টেবিলের ওপরে শ্যাময় লেদার

তুমি বুঝি কাচও কাটতে পারো? ওটা কি ডায়মন্ড? কতটুকু? একটুখানি? অনেক দাম?

১৯৭৫ সালের স্বাধীনতা দিবস থেকে গব্বর হাসছেন, স্টাফ সিলেকশন কমিশনের চেয়ারম্যানও হাসেন, জ্যায়সে লোহে লোহাকো কাটতা হ্যায়। সামনে বসা ছেলেটা মেয়েটার আকাশ কালো করে মেঘ জমে আসে। নীলবর্ণ মেঘ গাছের অপত্য স্নেহ।

ও তো বৃষ্টি হবে! নদী হবে আকাশের নীচে! গাছ বাড়ি মেঘ রাস্তা নদী বন্ধু বন্ধু বন্ধু বন্ধু বন্ধু!

এইবারে গান হোক, সুতলি পাকিয়ে পাকিয়ে নেওয়া হবে সুর থেকে। ভাষার ভেতরের আরো ভাষারা ফুট তোলে;
আধো কথা আনমনা কথার পাশে বুঁদ হয়ে জখম ভাষার মেরামত খোঁজে কাচের দোকানি।
কাচ কভু আয়নাও হয়।

এই কাটা, এই গোল্লা, এইইই গোল্লাছুট, এইইইইই মাসির বাড়ি, এইইইইই জলকে নেমেছি

কতখানি শাদা পাতার ভেতরে অক্ষর জন্ম নেয়, ভেবে নেওয়া,
ব্লেডের মহিমা অনায়াসে পরত পরত খুলে অক্ষর চেঁছে বেমালুম ভ্যানিস
নে এবারে; কতখানি গেঁথে দিতে পারিস, কতখানি উড়াল, ঘষামাজা, মনে রাখা

সদৃশকোণী ঘুড়ি, হাওয়া- ঢং, ঠোঁট ফোলা চক্কর। হাসানের দৌড়;
কাটা ঘুড়ি কোথায় পড়বে সেই তো জানে; বাদশাহ অব কাবুল
ধুলোর ওপর নিঃশব্দ খালি পা।

ওতো জলের ভেতর .. ঘুড়িদের মাছ .. জলপিপি পোকাদের ওড়াউড়ি.. হাওয়া কাটকুট .. ঢেউ ঢেউ

দুপাশের ধার দিয়ে শোলার মহিমা কাটা যায়; তার চূড়া চালচিত্র মালা দড়ি ইত্যাকার
জিনিসের বরাত আসে যায় নাতিশীতোষ্ণ উৎসব যে কালে ঘটে। পটে লেখা কথামালা জলের রঙে
ধুয়ে ধুয়ে ধুয়ে ধুয়ে সাদা।

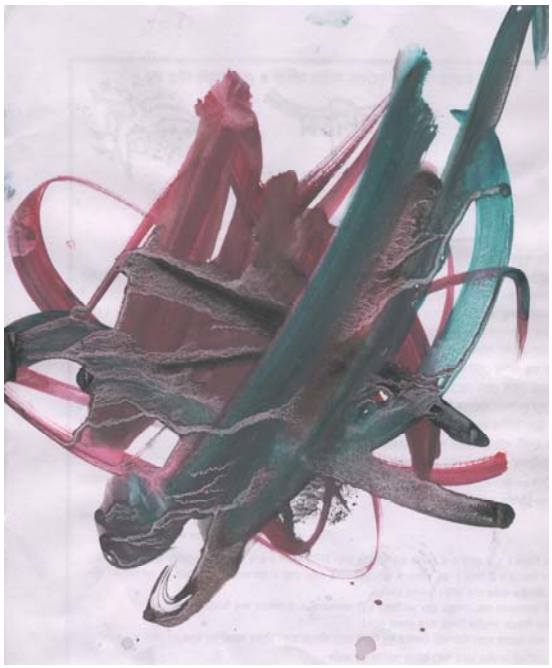

নুন ও বাকলের আধার জমিয়েছে বর্ণ।
ইস্পাত কোয়ার্জের ধারালো পিপাসা মেটাতে পারে নরম ও মিহি ত্বক,
একথা স্পষ্ট করে বোঝা গেল ঘুমের আগে; বৃষ্টির মধ্যে নোংরা গলিতে ফেলে গেল আদেশের পুত্তলি!

রঙ বদলালে ধোঁয়া হয়, চটচটে আঠার চকোলেট, অ্যালিয়েন শুঁড়, আর সব বুটিদার কথা

শিরা ও জালের কালো ধোঁয়ার ছিটেবেড়া। চোঁচ বলতেই বেড়া থেকে খুলে তর্জনীর ডগায় ফুটে গেল।
আবার বেড়ার ফুটোতে চোখ রেখেছিলি! জানোয়ার!

ফিতে বাঁধা হরিণ, ঝুলনের মাঠে ঘাস খায়, চিড়িয়াখানার পুকুরের জল ছেটকায় জিরাফ

গাঢ় হেমাটাইটের বাঁধন বেঁধেছে পরি। দোলনার ঘুমে কী যে আহ্লাদ, তিরিতিরি গলে গলে মেশে মোহানার জলে;
শহরের বহুতলে হাওয়া এসে ঝড় হয়। কাটগ্লাসে খেলনার ঢং ।

গননার শুরুতে কী আঁধার কী আঁধার।

আমাদের দেয়ালে ঘড়ি থাকে চুপ আমরাই কথা বলি ঘড়ি ঘোরে থামে কখোনো ভ্যানিশ।

দালির গোঁফের ডগা ঘিরে মোহজাল। গলে গলে পড়ে অন্তিম আঁধার। ঢং করে সেন্ট পিটারের পেটা ধ্বনি শুনি, লক্ষণের টংকার, অনন্ত প্রহরার শেষে গোমতীই ঠিক হয়। ডুবে থাকে গাঢ় বিষ।

দেয়ালে দেয়ালে কত সময়ের বীজ ও আগুন। দেশে দেশে বিদেশে বিদেশে। সেসব ট্যুরিস্ট গাইড জেনে থাকে। তার পিছু পিছু সময়ের ঢিল আচমকা ফাটলের ঘরে উঁকি দেয়।

‘গেহ আর পাইব কোথা’ এই গাওয়া মাত্র ফ্রিজ শটে দুইমাত্রা দশ। দেহবোধ গলে গলে মেশে, আঁধারে আঁধার।

বাড়ির দেয়ালে ঘড়ি বলে টিক টিক। আমাদের ‘চুপ করো’ বলে। আর নিজে জোরে বলে ওঠে।

তারপর রাক্ষসীরাণী আসিয়া পড়িল,

আসিয়া পড়িল কী ? খেয়ে নিল? নীলকমল ঘুমিয়ে পড়েছিল? রাজকুমার? তরোয়াল?

ক্রমে .....বিরহগান দস্তুর হইতেছে। কেহ জানে না কী কী স্বর মিলাইতে লাগিল। ভাসমান দ্বীপের ন্যায় সুয়োরানির পর্ণকুটীর ভাঙ্গিয়া বিল্ডাররা মল বানাইতেছেন। এইবার তাহাদের জিহ্বা লোল হইল। অনাঘ্রাতা যাহা কিছু মুর্খের ন্যায় আত্মসাৎ করিতে তাহাদের বাধিল না; তাহারা অবলীলায় ইহা প্যারাডাইম বলিলেন।

নমিয়া বুদ্ধে পাদনখকণা তার...

পাদনখকণা কী? ভাই কী যাবে আমাদের বাড়ি? ... ও কোথায়? ওই লোকটা? ও কী দুষ্টু লোক?

স্মৃতি ভোরের ধারক। ভারসাম্য থেকে স্থিতাবস্থার দিকে গড়ায়, স্থির থাকে মোহে, মোহের কাজলে, দূরাগত স্বরে, আন্ড দেয়ার ইস লাইট। পর্দা সরলে একই মঞ্চে উত্তমকুমার উৎপল দত্ত ম্যাকবেথের রোলে অভিনয় চালাতে থাকে। আমরা নীচ থেকে এংকোর এংকোর বলে চ্যাঁচাই। কেউ শোনে না। কোনো লাভ হয় না। দুপাশ থেকে দুজন অভিনেতার তীব্র সঙ্ঘর্ষের আতঙ্ক দেখব বলে বিরাট এক সুড়ঙ্গ খনন করে বসে থাকি। কণা ভগ্নাংশেও যদি সে আসে!!

কখন আসবে? বলো কখন? কখন আসবে? বলো না কখন? জলের নীচ দিয়ে সাঁতার শিখেছি; নিয়ে যাবে আজ?

আহ্লাদ পায়ে করে আনে ধুলো। আবিরের রেনু। সকালেই গাছের গল্প।
হাসপাতালে মাঠে ময়দানে কারণে অকারণে পলাশের লাল চোখে।

আলো পেড়ে দাও আলো আরে এ এ এ আলো....রং আরে এ এ এ এ দোল খেলাআআ দোল রঙ

প্রতিবার রশিদ গায় মোরা সাইয়াঁ বুলাবে এ এ এ ততক্ষণে আগুনের আঁচ আকাশ ছুঁয়েছে। নীচে পুড়ে যাচ্ছে আলু আর কুড়িয়ে আনা আনাজ। আজ রাতে টিকা হল, গব্য ঘৃত পোড়া অঙ্গার। কাল আরো কিছু, ছাই ও রঙের নীচে জীবনের সেরা বিজ্ঞান অন্ধও যেভাবে শেখে। অথচ তুহিন ফ্রকের ওপর তুলির অজস্র কারিকুরি মোহের ঘর। মেনে থাক ফোঁটা, মেনে থাক যেকটা বছর গড়িয়ে চলে এল বিলকুল সাদা...এখন জমির জলে শুয়ে থেকে সম্মোহন। গানের ধ্বনির থেকে দূরে শব্দ ভুলে যাওয়া খড়ি ওঠা দাগ।

কেন শুয়ে আছ? এখানেই তো আমাদের বনফায়ার, পাতার বাহার জোগাড় করেছি, গান গাও।

ঢালু জমি থেকে উবর খাবর থেকে হাঁটার বিন্যাস তৈরি করে প্রাণি। জোগাড় করে আনে সন্তর্পণ। থাবা। ফ্যাকাসে পুরু নরম পায়ের তলার মাংস ঢাকা চামড়ায়। গন্ধর্ব তেল খুঁজে পেতে আনে রমণীর স্বামী। উল্লাসে রং ভিজে যায় গেলাসে গেলাসে। কাচের গায়ে বুদবুদ সকলি মিলায়।

মহাকাশযান। আমাদের। তুলির ভেতর পেটের ভেতর আকাশের তারাদের ভেতর এই আমাদের।

পাদুকাজুড়ে শূন্যতা। প্রতিরূপ কাজ করে। মহাকাব্যরা এমন ঢং বজায় রেখেছে চিরকাল। সবখানে। লুকোছাপা নেই। আয়নিত সূর্যের থেকে দৃষ্টি ঘুরে গেল। ঢেউ ঢেউ ঢেউ আর ঝড়।

ফুটিফাটা জুতো থেকে খুঁটে খুঁটে পেরেক ও আঠা তুলে নেয় মুচির বড়োছেলে। ও পাথর বসিয়েছে গতকাল। গাছের গায়ে সিঁদূর পড়িয়ে রীতিমতো রোজগার শুরু হল আজ। মিনারের ডগা থেকে লঘু গুরু ভেসে যায় কোন সে অসম্ভবের দেশে তা সেইইই জানে। তুলো ভালো ডেকান ট্র্যাপে হয়। অথচ কী একটা গোলমালে মাইল মাইল পেট্রল পাম্পগুলো সিল। সেখানে পরপর শ্রেনিবিভাজিত দোকান। শ্রীকৃষ্ণ জানতেন।

কী শিখব নাচ গান আঁকা কবিতা গল্প..... আকাশ ? মাটি? নদী ? জল ? পাতা? পাহাড়?

গহনের পায়ে বল। হাতে আঁকা ক্যানভাসের মেয়ে পথ দেখিয়ে নিয়ে গেল অলীকের মাঠে। ওরা সব ডাইনি, ছেলেধরা। তবে আমাকেও কেন ডেকে নিয়ে গেল? আমি তো মেয়েই। কাঠকুটো ধুলোর ওপর জড়ো করে ছবি বানিয়েছি। এই তো চিহ্নের শিষ ভেঙ্গে রেখে গেছে পোষাকের সুতো। বেছে নাও জল নামা পাথরের দূর্বল অংশটুকু। ঐ তো পথ, দূর্বলতা ধরে ওঠে চূড়া অথবা চৌম্বক ক্ষেত্রের দিকে।

বাঃ নিয়ে গেলে না তো। স্নান সেরে জল না মুছেই বেড়িয়ে এসেছি আমি। কোথায়? সে কোথায়?

অসীমের মাঠের পাশে রাস্তার বাতিস্তম্ভের নীচে হলুদ হয়ে আসা আলোর বৃত্তে নিজের মেয়ের এতোল বেতোল হয়ে আসা হেলায় ছড়িয়ে রাখা আঁকা যত্নে তুলে এনে বিবর্ণ পাতা- ওয়ালা খাতায় জমিয়ে রাখে এক বাবা।আমাকে দেখায় তার রঙ, তার ঐশ্বর্য, তার তুলি আর হাতের টানের ক্যারিশমা। ছবি অনেক। আমি সাতখানা রঙ তুলে আনি আমার বহুদিনকার অন্ধকার ঘরে। আলো জ্বলতে শুরু করে। বাবাটি আমার বন্ধু। মেয়েটি রুপসু।

এইবার শুরু হয় কথোপকথন। ছবির সাথে, রুপসুর সাথে। শব্দের গড়ে ওঠার সাথে। শব্দের গভীরে যে শূন্যতা তার সাথে। কথোপকথন, টানা, কখোনো শুধুই সহাবস্থান, কোনো কথা নয় ছুঁয়ে থাকা। স্পর্শের রেনু রেনু ক্রমে ছেয়ে যেতে থাকে এক দুটি শব্দের আদল ফুটে উঠতে থাকে কবিতার পাঠযোগ্য বয়ানে। এও এক যৌথতা। একমুখী, বহুমুখী, নানান প্রক্রিয়ার ভেতর দিয়ে টের পেতে চাওয়া। ভেতর থেকে উঠে আসে রুপসুর বলা কথা না বলা কথা ভেসে আসা ছবি, দৃশ্যমান বিশেষণগুলি।

<u>প্রক্রিয়া এক</u>

ছবি সংগ্রহ করা। লক্ষ্য ছবিকে কবিতার পরিপূরক বা ইলাসট্রেশন হিসেবে না দেখে একটা অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ বা অংশ হিসেবে নির্ধারিত করা। এবং এক্ষেত্রে ছবি বাছা হয়েছে এমন একজন শিল্পির যে শিল্পগত দিক থেকে কুমারি অর্থাৎ ভারজিন। যার মধ্যে জ্ঞান এর দুষণ মোটেই নেই।

আমার বন্ধু চেষ্টা করে মেয়ের জন্যে আঁকার মাস্টার খুঁজে দিতে। আমি টালবাহানায় এড়িয়ে যাই। জোরালো প্রতিবাদ করি মোলায়েম প্রতিবাদ করি। বলি না দরকার নেই। এখনই ওর অবাধ ভাবনার ডানায় নিয়মের দাগ টানার দরকার নেই। আর এমনি বলা কওয়ার মধ্যে একদিন রাতে অমাবস্যার চাঁদের অপেক্ষায় হলুদ সোডিয়াম বাতিস্তম্ভ জ্বলবার পর আমার হাতে আসে ছেঁড়া পাতা, টাইপ হওয়া বাতিল পৃষ্ঠার পেছনে রঙের উচ্ছাস ও তার গতিময় রেখার চলাচল।

<u>প্রক্রিয়া দুই</u>

অবলোকন। এবারে শুধু দেখতে থাকা। ছবিগুলিকে স্ক্যান করে বৈদ্যুতিন মাধ্যমে নিয়ে আসা। তারপর শুধু দেখতে থাকা। টানা। ছাড়া ছাড়া। ক্রমশ শব্দ জন্মাতে থাকে এক দুটো। রঙের গভীরে কথা জন্মাতে থাকে। সেগুলি লেখা হয়। পরপর।

সব শব্দ সব কথা জমতে থাকে। সেগুলো রুপসুর ছবির প্রতিফলনের ক্রিয়ায় তৈরি হয়ে ওঠা শব্দ। ভেসে বেড়ানো শব্দ। কুড়িয়ে পাওয়া। পথচলতি উড়ে আসা। স্মৃতির ভেতর থেকে বুদবুদ; পানা পুকুরের পাক থেকে নিঃশব্দ ওঠা টুব টপাক শব্দে জলের উপরিভাগে এসে ছড়িয়ে যাবার প্রয়াস, তুলে আনা একেকটা মায়াবী ঢং, সুঠাম ও বেঢপ চেহারা। দেখার কাজটা চলতে থাকে কম্পিউটারে যেখানে সেখানে সুযোগ মিললেই। অন্যথায় মনে মনে মুখস্ত দৃশ্যের, জীবন বিজ্ঞানের আঁকা যেন। দ্বিধা থাকলেও রঙ রস রূপ সহ যা দিব্যি মনে রয়ে যেত বহুকাল। রঙের তারতম্য কী কী ঘটে যেত, নিত্য নতুন রঙের আর এক পোঁচ অথবা ছবির পাশে আরও অনেক ছবির ভূবন। তো এই চলল বেশ কিছুকাল। সময় গড়াতেই থাকল। নতুন শতাব্দীর প্রথম দশক শেষ দ্বিতীয় দশকের শুরু। ২০১১ সাল। জুন মাসের শেষ। অবলোকন শুরু।

প্রক্রিয়া তিন

ছবিগুলি নিয়ে রুপসুর সাথে কথা বলা। রুপসু কখোনো মনোযোগী, ছবিতে। কখোনো সদ্য দেখা কার্টুন অথবা কম্পিউটার গেমসে। ওর কাছে কোনো কোনো সময়ের বিন্দুতে দাঁড়িয়ে ছবিগুলো মূল্যহীন, অথবা অস্তিত্বহীন। তবু তাতে বেশ কিছু অন্তর্লীন কথা বেরিয়ে আসে। টুকরো শব্দ। নৈর্ব্যক্তিক স্বরে বলে রুপসু। যেন বহুবার খেলা মারিওর সামনে কোনো বিপদ নেই, কোনো আশংকা নেই।

বিভিন্ন সময়ে পাওয়া রুপসুর অন্তর্বর্তী কথাবার্তা গুরুত্ব নিয়ে লিখে রাখা। এক্ষেত্রে অধিকাংশ সময়ে নির্ভর করতে হয়েছে স্মৃতির ওপর। কোনো পূর্বজ্ঞান, কোনো কৌতূহল রুপসুর ওপর না চাপানোরই উদ্দেশ্য ছিল। ফলে শব্দ শব্দাবলী ওর উপস্থিতিতে টুকে রাখার চেষ্টা করা হয়নি। ওর ইচ্ছার বিরুদ্ধে ছবি আঁকা / আঁকানো বা ছবি নিয়ে আলোচনার / নয়া মোড় ফেরানোর কোনো সজ্ঞান চেষ্টা করা হয়নি। আপসে যা উদ্ভুত হয়েছে গড়িয়ে এসেছে ওর কাছ থেকে সেটাই গ্রহণ করা হয়েছে। এটা একধরণের যোগাযোগ পদ্ধতির পরীক্ষা যার সংগে আধুনিকোত্তর কোনো প্রযুক্তির, অর্থাৎ রেকর্ডারের সাহায্য নেওয়া হচ্ছে না।

প্রক্রিয়া চার

এবারে আরো একটু এগিয়ে ছবির মধ্যে থেকে আরেকটা মনোবাস্তবতা তৈরীর চেষ্টা। এটা একটা বিস্তৃত সময়ের ঘটনা। একই ছবি থেকে একটা দুটো তিনটে সংঘটন। একের উপর আরেকটার উপরিপাতন। বহমান সময়। এর বিস্তার থেকে তৈরী হয়ে ওঠে একাধিক মনোবাস্তব ধারনা বা আবহাওয়া যা ছবিকে এড়িয়ে আগে, পিছে, পাশে, ভিন্ন স্থানাংকে আপাতভাবে স্থির হয়, পাঠকের দৃষ্টি না পড়া অবধি।

ভিন্ন ভিন্ন যে সমস্ত উপাদান এসে জড়ো হয় তাদের উৎস স্মৃতি, পঠন, মনোদৃশ্য, ঘটনাবিশ্ব, আরো নানাবিধ অঞ্চল। সকল মিলে একটা খন্ডচিত্র। পরপর এভাবে স্তরীভবন ঘটে। একের পর এক, একটা দীর্ঘ সময় ধরে। স্তরবিন্যাসে রুপসুর স্বর দেখা যায়। প্রলেপের পলি যেমন পরে, তেমনি অন্য শব্দ বিন্যাসের মাঝে মাঝে সেইসব শব্দের স্তরবিন্যাস শায়িত থাকে। তাকে কবিতার বা পাঠবস্তুর শরীরে মিলিয়ে দেবার চেষ্টা থাকে। বস্তুত এখানে এই মেলানোর প্রক্রিয়াটি অসম্পূর্ণ। এবং কবিতাপাঠবস্তু নির্মান শেষ হবার পরও মেলানোটি শেষ হয় না কারন এটা একটা গতিশীল সাম্যাবস্থার জন্ম দেয় যা পাঠক- পাঠবস্তু এই সম্পর্কের মধ্যে দিয়ে সতত চালু থাকে। এই অবলোকন ভংগীর মাধ্যমে কবিতাটিতে অনন্ত সম্ভাবনার জন্ম ঘটতে থাকে। পাঠবস্তুতে বাঁকানো হরফে অন্য স্বরের স্ফুট বাক্যের মধ্যে ..... !!! ??? ব্যবহারের মধ্যে দিয়ে এই অনন্ত সম্ভাবনাকে আরো খানিকটা উস্কে দেওয়া হয়েছে।

প্রক্রিয়া পাঁচ

একজন ভাস্কর যেভাবে তার তৈরী দৃশ্যবস্তুটাকে ঘসে মেজে নির্মানের অন্তিম কাজটুকু করেন, সেই পদ্ধতিকে অনুসরন করা হয়েছে। আপাত সম্পূর্ণ হবার পর বিভিন্ন অংশ মুছে, সজ্জিত করে শব্দ বদলে, ঘসে মেজে কোথাও ধারালো কোথাও ভোঁতা করে সংহত করে একটা রূপ দেওয়া হয়েছে যা এক বিশেষ সময়ের বিন্দুতে, অন্তিম রূপ।

১০ মার্চ ২০১২ ।। ৩১ মে ২০১১ ।। সময়ের মানকে দুটি বিন্দু। তার মাঝে অনন্ত সময়ের বিস্তার আপাতভাবে সসীম। শুধু প্রতিটা বিন্দু সম্ভাবনার কথা বিচার করলে এর অসীমসংখ্যা টের পাওয়া যাবে। অর্থাৎ পাঠক যখন একে দেখবেন তাকে তাকাতে হচ্ছে একটা বিশেষ নির্মানের দিকে যা ১০ মার্চ ২০১২ তারিখে স্থিরীকৃত। এবারে

পাঠক বা দ্রষ্টার অবলকন তাকে একই বিন্দুতে রাখতে পারে বা অন্য কোনো বিন্দু, বা অন্য কোনো ধারকতলে নিয়ে যেতে পারে। এই পরবর্তী বিন্যাস (pattern) অনন্ত ও যথেচ্ছ (random)।

বি.দ্র. স্তরীভূত শিলার স্তরবিন্যাস, পাললিক শিলার স্তরবিন্যাস, এই পাঠবস্তুর দেহগঠনে (**morphology)**। শিলাস্তরের বয়স বৈজ্ঞানিক নির্ধারণ করতে পারেন, আর শব্দের? শিলাস্তরবিন্যাস আঁকাবাঁকা ভাঁজখাওয়া নানা ভঙ্গীমায়। শব্দ বা বাক্যে, হায় !!